এক ব্যর্থ মাতৃবন্দনা

যুবায়ের হাসান

কী লিখবো তাঁকে নিয়ে? কিছু লেখা যাবে কি? কিছু লেখা বা বলার পূর্ণসামর্থ্য বা মানসিক যোগ্যতা নিয়ে তো আমার নিজের মধ্যেই গভীর সন্দেহ আছে।

তিনি যে আমর 'মা'। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পর্ক। এ বিশ্বচরাচরে এর থেকে পবিত্রতম, গভীরতম সম্পর্ক আর আছে কি? আর এরকম একজন মানুষকে নিয়ে তাই কিছু লেখার চেষ্টা পৃথিবীর দূরূহতম কাজগগুলো একটা বলেই মনে হয়।

সর্বব্যাপী মাতৃরূপের কী প্রশস্তি গাইবো? তাঁর সম্পর্কে কোনো অভিব্যক্তি বা প্রকাশভঙ্গিই তো যথেষ্ট হবে না! 'মা'-মানুষের জীবনে এক মহত্তম সম্পদ। অনুভবের শ্রেষ্ঠতম নির্মাল্য। 'মা' নামে মধ্যেই যে চিরন্তন অথচ সর্ববিস্তারি মহিমা ছড়িয়ে আছে, কোনো বর্ণনাতেই তার সামান্যতম প্রকাশ করা যাবে বলে বিশ্বাস হয়না। তবু তাঁকে নিয়েই কিছু বলতে হবে যতো খন্ডিত, যতো সামান্যই তা হোক না ক্যানো। তাই এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

কতকাল আগের কথা। 'ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে শিশুকালের প্রায় সব ঘটনাই।....তারমধ্যেও দু'একটাস্মৃতি ঝিকিয়ে ওঠে আজো রোদের একফালি আলোর রেখার মতো। জীবিকার তাগিদে শিক্ষিকা মা গ্যাছেন স্কুলে। অবোধ দুধের এক বাচ্চা মায়ের ছেড়ে যাওয়া শাড়ি বুকে জড়িয়ে আঁচল চিবিয়ে যাচ্ছে। উপায়ন্তর নেই যে ওর। ছেড়ে যাওয়া শাড়ির উষ্ণতায় ও ফিরে পেতে চাইছে জন্মদাত্রী আত্মজার একান্ত আশ্রয় আর নির্ভরতা। জীবিকার প্রয়োজনেই বাচ্চাটির মা-কে একবার যেতে হয়েছিলো দেশের বাইরে প্রায় এক মাসের জন্যে। ওর বয়স তখন এক বছরের নীচে। ওর মতোই ওর দু'জন বালক ভাইয়ের হলো বেহাল দশা। ওদের দিন আর কাটে না...প্রতীক্ষাও শেষ হয় না। প্রিয় মানুষটিকে ফিরে পেতে চায় ওরা। কোথায় গ্যাছে, ক্যানো গ্যাছে, কবে ফিরবে– এসব বিষয়ে বিশেষ কোনো ধারণাই তৈরি হয়নি ওদের। শুধু অনাথের মতো পথ চেয়ে থাকা! মায়ের অভাব কি কোনো কিছু দিয়ে পূরণ হয়? বেড়ে ওঠার বয়সে দেখেছি, সংসারের বিরাট ভার প্রায় পুরোটাই তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে। বাবা গ্রহণ করেছেন দুর্বোধ্য এক সৌখিন বৈরাগ্য। বাধ্য হয়ে তাই এই অপরিণত বয়সী মহিলাকে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে একাকী নিঃসঙ্গ সৈনিকের মতো। এবং এ লড়াই ছিলো জীবনের শেষ অবধি। বলতে আজ আর দ্বিধা নেই, এই লড়াইয়ে আপনজনেরা কেউ-ই তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ায়নি। (এ কথার ব্যতিক্রম হয়ে থাকলে নিজগুণে ক্ষমা করে দিবেন)। পৃথিবীর রীতিই বোধহয় এই। নানামুখী চাপে-তাপে, সঙ্গতকারণেই মাঝবয়সেই মা'র শরীরে রক্তচাপ দেখা দিল। বান্ডিল-বান্ডিল স্কুলের খাতা দেখতে দেখতে, সংসারের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়া....কখনো-সখনো আমরা ভাইয়েরা মিলে সে-সব খাতার নম্বর গুণে দেয়া...একটু চাপ কমানোর চেষ্টা আর কী! মাধ্যমিক পরীক্ষার সবুজরঙা টেবুলেশন-শিট। সেই শিটে নম্বর ওঠানো ও যোগের কাজটি ছিলো খুব জটিল আর কষ্টসাধ্য কাজ। কীই বা বয়স ছিলো তাঁর তখন। তবে মধ্যবিত্ত পরিবারের আর দশজন গৃহবধূর শান্ত, ছকে বাঁধা জীবন তিনি পাবেন কোথায়? যৌবনের বর্ণময় দিন আর গীতল অবকাশ তো তাঁর জন্য নয়। আর এভাবেই শেষ হয়ে গ্যাছে তাঁর মধ্য যৌবনের অমূল্য দিনগুলি। একেবারে সঠিক বলা হলো না। এই কঠিন জীবন সংগ্রামের মাঝেও মা তাঁর নিজের মতো আনন্দ-আরাধনার

চেষ্টা করে গ্যাছেন। সংস্কৃতির নানা মাধ্যমের পাশাপাশি খেলা-ধূলার মাঝেও নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। হয়তো বেদনার নীল সাগরে গান বা কবিতা অথবা খেলা এক একটা দ্বীপের মতো তাঁর জীবনে জেগে ছিলো।

মা ছিলেন প্রচলিত আধুনিক গানের ভক্ত। গানের গলাটি ছিলো যথেষ্ট মিষ্টি। জীবনের শতমুখী বাধা আর প্রতিবন্ধকতার মধ্যে করে, কীভাবে একটু-একটু করে গান শিখেছিলেন তা আমার জানা নেই।

শৈশবকালে মাঝেমধ্যে ছুটির সন্ধ্যায় আমাদের বাষায় বসতো গানের আসর। আরো অনেকের সাথে শুনেছি তাঁর অনেক সুরেলা গানও। লতা, সন্ধ্যা, সাবিনা....এমনকি তাঁর নিজের গান। নিজের গান বলতে নিজের লেখা আর সুর দেয়া গান। যে গানগুলোরও মজা কম ছিলো না। এখনো য্যানো কোনো প্রায়ান্ধ রাতে শুনতে পাই, সীমানা ছাড়িয়ে, গাঁ পেরিয়ে, আমরা যাবো বহুদূরে....। বছর বারো -তেরো আগে নতুন উপসর্গ হিসাবে 'ডায়াবেটিক' যোগ হলো। এরও কবছর পর হৃদপিন্ডের সমস্যা। দীর্ঘ অসুস্থতার মাছে গান ছিলো মা'র নিত্যদিনের সঙ্গী পথ্যের মতো শেষের দিকে এসে, গানছাড়া তাঁর স্বাভাবিক ঘুম পর্যন্ত আসতো না। মাথার কাছে বাজতো এক পুরাতন ক্যাসেট প্লেয়ার। পুরাতন ভৃত্যের মতো এ যন্ত্রখানাও কম সেবা দ্যায়নি। হাসিয়ে মাত করে দিয়েছিলেন। টেলিভিশন আসার আগে, বাড়ীশুদ্ধ মানুষ আমরা 'আকাশবানী' বেতারের বাংলা নাটক শুনতাম নিয়মিত। এসব নাটকের নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে মার জুড়ি মেলা ভার।

যতোদূর মনে পড়ে সত্তর দশকের শুরুতে মার সাহিত্যজীবনের শুরু হয়েছিলো ছোট গল্প লেখা দিয়ে। পরে প্রবন্ধ-নিবন্ধ-কথিকা এবং আরো পরে, কবিতার পায়ে নিজকে একরকম উৎসর্গই করেছিলেন। সাহিত্য-পত্রিকা আর রাজশাহী বেতার কেন্দ্র ছিলো তাঁর সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রভূমি।

মা ছিলেন মূলতঃ বাংলার শিক্ষিকা। শরৎচন্দ্রের দত্তা, গৃহদা, পথের দাবীর মতো উপন্যাসগুলো ছিলো অনেকবার পড়া প্রিয় উপন্যাস। শরৎবাবুর অসাধারণ নারী চরিত্ররা বোধকরি ছিলো তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যভাবনা নিয়েও তাঁর আগ্রহের কমতি ছিলোনা।

ছাত্রীদের সাথে ছিলো তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। স্কুল জীবনে তো বটেই স্কুল শিক্ষকতা শেষ করার অনেক পরেও প্রায় সবখানেই তাঁর অনুরাগী-একান্ত ভক্ত ছাত্রীর দেখা মিলতো। আলাপে-গানে-কবিতায় ওদের সাথে সময় কাটিয়ে দিতেন। একান্ত আন্তরিক, ঘরোয়া, স্নিগ্ধ যে সময়! তখন মাকে মনে হতো স্বর্গের এক দেবনারী।

গালর্স-গাইডারদের মধ্যেও ছিলো তাঁর অগুণতি ভক্ত। খেলায়-শরীর-চর্চায় আর হাসি-তামাশায় ওদেরকে মাতিয়ে রাখতেন। সাংবছর ওদেরকে নিয়ে দেশের এপ্রান্তে-সেপ্রান্তে 'জামবুরি' করতে যেতেন।

পরিপার্শ্বিক সমাজের বিভিন্ন স্তরেও তাঁর কম অনুরাগী ছিলো না। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন। চরিত্রের সরলতা, আন্তরিকতার গুণে দোকানদার, ব্যাংক কর্মচারী, রাস্তার মানুষ... সবার কাছেই ছিলেন তিনি একান্ত আপনজন।

চাকরি সূত্রে বেশ কয়েকবছর আমাকে রাজশাহী থাকতে হয়েছে। শহরের নানান স্ণ্টরের শিক্ষিত লোকজন আসতো আমার কাছে। অনেকসময় আমার ব্যক্তিগত পরিচয় স্পষ্ট করতে তাঁদেরকে

বলেছি, আমি হেলেনাবাদ স্কুলের জাহানারা আপার ছেলে। এটা জেনে অনেককেই হই-হই করে উঠতে দেখেছি, আমার সম্পর্কে তাঁদের শ্রদ্ধাবোধ কিম্বা স্নেহবাৎসল্য সঙ্গে সঙ্গেই উৎসারিত হয়ে উঠতো। এ বিষয়টা আমি খুব উপভোগ করতাম। মা'-র মৃত্যুর পর মানুষের ঢল নেমেছিল আমাদের বাড়িতে এই মানব-মিছিলের অধিকাংশ মানুষকেই ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারিন। তবে আমার পরিচয় পাওয়া মাত্রই এঁরা অভিন্ন একটা কথা আমাকে বলেছে, তা'হল: আমি আপার খুব ঘনিষ্ঠ আর কাছের মানুষ ছিলাম...আমাকে উনি খুবই ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন।

এরকম ঘনিষ্ঠজনের সংখ্যাধিক্য দেখে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিলো না যে, নিজগুণেই তিনি এই গুণমুগ্ধদেরকে নিয়ে ভক্তবলয় তৈরি করেছিলেন, যা ছিলো একান্তই স্বত:স্ফূর্ত। এ-ও জীবনের এক উপরি-পাওনা।

মা-র মন ছিলো শীতকালের পদ্মানদীর জলের মতো স্বচ্ছ, পরিষ্কার। অবারিত, অনন্ত আকাশের ছায়া পড়েছিলো সেই স্বচ্ছ-নির্মল মনভূমিতে। অন্তরে-বাহিরঙ্গে তিনি ছিলেন অভিন্ন, কথা-কাজে ছিলো না কোনো ফাঁক। মানুষ তো তাঁকে ভালোবাসবেই। কোনো এক অলৌকিক ভাগ্যগুণে, আমরা তাঁর সন্তান হয়ে জন্মেছিলাম। সন্তান বাৎসল্যের বিবেচনায় পৃথিবীর আর দশজন অসাধারণ মায়ের নামের পাশে তাঁর নামটিও লেখা যাবে অবলীলায়। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্যা। আমাদের পড়াশোনা গড়ে ওঠা.....সবকিছুর জন্যই মা তাঁর পুরো জীবনটা উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর এই সংগ্রাম কী জীবনের এক মহার্ঘ সাধনার পর্যায়ে পড়েনা? আমিতো মনে করি, জীবনের উত্তাল-অনিশ্চিত সাগরে তিনি ছিলেন এক জীবন্ত সিসিফস।

জীবনের সকল যাতনা, সকল বঞ্চনা, সকল শোক-তাপ মা বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। জীবনের সকল বিষ আকণ্ঠ পান করে তিনি হয়েছেন এক নীলকণ্ঠ পাখি। একাকী, নিঃসঙ্গ সেই পাখির কণ্ঠে ছিলো বেদনার্ত হাহাকার গানের লহরী, সুরমুর্চ্ছনা। স্বাক্ষী রইলো তাঁর খুব কাছের কয়েকজন মানুষ। আর স্বাক্ষী হয়ে থাকলো তাঁর সৃষ্ট কবিতামালার পংক্তি।

আমি ছিলাম মা-র জীবনে অন্ধের যষ্ঠি। বাকী তিন ভাইয়ের প্রবাসজীবনে জনিত অনুপস্থিতির কারণে আমি-ই তাঁর শেষ অবলম্বন। কিন্তু গভীর লজ্জা আর অনুতাপের সাথে বলতে হচ্ছে, জীবনের এক সংকটপূর্ণ কালে এই মাহন মানবীর প্রতি যে মনোসংযোগ ও আত্মনিবেদন প্রার্থিত ছিলো, নানাকারণে তা প্রদানে আমি সফল হয়ে উঠতে পারিনি। সন্তান হিসাবে আমার এই ব্যর্থতা ক্ষমাহীন ও শত অনুতাপেও এ গ্লানি মুছবে না। অযোগ্য, অম্পূর্ণ সন্তানের অন্তর্দহনেরও তাই কখনো শেষ হবে না। চোখ থাকতে যারা চোখের মর্যাদা দিতে জানে না-তাদের তো একটা বড়ো শাস্তি প্রাপ্যই। তবে, দন্ডবরণ করলেই কৃত অপরাধের দায মোচন হয় না। আজ এই তথাকথিত মাতৃবন্দনায় তাই মাতৃঋণের তিল পরিমাণও শোধ হবে না। হতে পারেও না।

২০০৬ সালের ১৬ নভেম্বর। আমার দুর্ভাগা মা-র জীবনের শেষ দিন। সেদিনের আলো-আঁধারির উষালগ্নটি হিংস্র, কুৎসিত এক বার্তা হাতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। মহাকালের মহা পরিক্রমায় সূর্য যখন তার আলোর পাখাটি মেলে আর একটি দিন শুরু করতে যাচ্ছে, আমার প্রিয়তমা দুঃখিনী মা-র জীবনে তখন চিরকালের আঁধার নেমে আসছে। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে দিনের প্রথম প্রহরেই হারালেন জ্ঞান আর জ্ঞানহীনতার এই পর্ব-শেষ হলো বিকাল চারটার পরপরই। অন্তিম যাত্রায়

শরিক হলেন তিনি সমাপ্তির গান না গেয়েই বিদায় নিলেন সেই হালভাঙা নৌকার দিশাহারা কান্ডারী। খুব একাকী, নিস্তব্ধ সেই যাত্রা। কাউকে নতুন আর কোনো কষ্টে না ফেলে এভাবেই চলে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর-ই এক কবিতায় দেখি:

বাইরে বাতাস কাঁপছে
বুঝিবা ফাগুনের ডানা বিদায় নিচ্ছে
শেষ বসন্তের পাখিরা উড়ে চলে যাবে–
হয়তোবা আমি থাকবো না তখন।
একদিন অনেক শব্দ ভিড় করে এসেছিলো আমার মধ্যে
আঙ্গুরের মতো থোকা থোকা,
এখন আমার ঠোঁটে কোনো শব্দ নেই
নিস্তব্ধ শব্দগুলো ঝরে ঝরে যাচ্ছে
অদৃশ্য কোন এক বিস্মিত হৃদয়!
এলোমেলো সব পড়ে রইলো
আমি চলে যাচ্ছি
আশ্চর্য আমার গন্তব্যস্থল, আমারই জানা নেই
তবু আমি চলে যাচ্ছি।
(চলে যাবার শব্দ/পাথরে নদী)

সন্ধ্যার কিছু পরে যখন এসে পৌঁছালাম তখন তো মা-র জীবনসন্ধ্যা ঘটে গ্যাছে। মা তখন অন্য জগতের বাসিন্দা। পাখি-ছাড়া খাঁচার মতো তাঁর দেহখানাই শুধু পড়ে আছে। শোবার ঘরের খাটের বদলে মেঝেতে পেয়েছেন আশ্রয়। বরফের বড়ো বড়ো চাঁই হয়েছে তাঁর বিছানা। চা-পাতার গুড়ো সারা শরীরে ছড়ানো। নিজ ঘরে পরবাসী হয়ে রাত যে পার করতে হবে!

কী সুন্দর ঘুমিয়ে আছেন মা। নিরব-নিথর মুখ। সাদা থান কাপড়ে জড়ানো। আগরবাতি, লোবানের পোড়া-গন্ধ। তথাকথিত পবিত্রতার পারিপার্শ্বিকতা। চলে যাচ্ছেন আমার জীবনের প্রথম আর সর্বশ্রেষ্ঠ নায়িকা। কোনো অভিযোগ অনুযোগ তাঁকে আর শুনতে হবে না। অযথা ভাবতেও হবে না কাউকে নিয়ে আর। আমি তবে কার কাছে যাবো? কার কাছে পেশ করবো আমার প্রাত্যহিকী? কোন মানুষের কাছে পাবো সুস্থ থাকার, ভালো থাকার অবিরাম সুমন্ত্রণা আর অনিঃশেষ স্নেহধারা? জানি, যাওয়ার জায়গা নেই। পাওয়ারও নেই।

জীবন বড়ো অনুদার। যে শুধু নিতে জানে, দিতে জানে সামান্যই। ছোট-বড়ো অনেক স্বপ্নই মা-র পূরণ হয়নি। প্রতিদিনই অনেক ইচ্ছারও ঘটতো মৃত্যু। শারীরিক মৃত্যুর আগে মানসিক মৃত্যু হয়েছে তাঁর অনেকবার। প্রসঙ্গক্রমে আর একটা উদ্ধৃতি দিই-

লালনের সুর ভেসে বেড়ায় পদ্মার ধূ-ধূ চরে
সাদা বকের পাখনায়
আমার ডায়েরীর পাতা লেখাহীন শূন্যে ওড়ে
বাতাস এনেছে বয়ে কী যে দীর্ঘশ্বাস!
চোখের সম্মুখ থেকে বিস্তীর্ণ মহাসড়ক

ধীরে ধীরে অপমৃত হয়ে যায়
দূরে-বহুদূরে আদি অন্তহীন,
চিক্ চিক্ করে জল শান্ত গোধূলি আলোয়
দ্যাখো, আমারই আঙ্গিনা থেকে প্রতিদিন আমি সরে যাই
এই শব্দহীন চলে যাওয়া বেওয়ারিশ লাশ হয়ো
দ্যাখেনা কেউ বোঝেনা কেউ।
(শব্দহীন চলে যাওয়া/পাথরে নদী)

মা-র তিনটি বুকের ধন-তিনটি পুত্র জীবন-জীবিকার তাগিদে দূর এক প্রবাসে থাকে। ভালো-মন্দে থাকে নিশ্চয়ই। এই তিন সন্তান আর ওদের পরিবার নিয়ে সঙ্গত আর অসঙ্গত দুশ্চিন্টার কোনো শেষ ছিলো না তাঁর। তিনি যে মা-জননী। তাঁর এই ভাবনার রথ থামায় কে! খুব ইচ্ছা ছিলো একবারের জন্য হলেও সেই দূরদেশে ঘুরে আসবেন। খুব সঙ্গত, সহজাত সেই চাওয়া। কিন্তু একান্ত দুর্ভাগ্য তাঁর। জীবন তাঁকে এই সামান্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। জীবনের জটিল রসায়নের শিকার হয়ে তাঁর সেই স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। অভিমানী মা-র করুণ মুখটি আমি কখনো ভুলবোনা। কখনো না।

মৃত্যুর আগে সে-ভাবে মা-র পাশে এসে দাঁড়াতে পারিনি আমরা কেউ-ই। আত্মীয় বা দূরের মানুষ থেকেছে তাঁর পাশে। মৃত্যুর পরে, আমরা তাঁর চার সন্টান উপস্থিত হয়েছি নিজ গৃহে....বড়ো দেরিতে শূন্য যে গৃহ....শূন্য যে বাড়ি। ভাবতে আরো কষ্ট লাগে, যখন দেখি তাঁর চাকরিজীবনের প্রাপ্য সকল অর্থ নিজে কষ্ট করে আমাদের জন্য রেখে গ্যাছেন। মা-র মৃত্যুর একমাসও পেরোয়নি। সবার মধ্যেই চলে যাবার তাড়া। জীবন আর জগতের নিয়মই যে এই! তাই বাস্টবতার কারণেই বোধ করি পনেরোই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় বসেছে বাড়ির মেয়েরা। নেতৃত্বে আছেন অভিভাবকতুল্য খালা-রা। খুব বেশি সময় লাগলো না। আমার কপালপোড়া মা-র নাতিদীর্ঘ জীবনের কষ্টে সঞ্চিত সামান্য সোনা-গয়না, শাড়ি-চাদর, এমনকি হাতব্যাগ-ঘড়ির মতো জিনিষও ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গ্যালো চোখের সামনেই খুব সুন্দরভাবে মিলিয়ে গ্যালেন মা আমাদের সবার মাঝে। ফুরিয়েও গ্যালেন কি?

বুকটা খালি হয়ে আসলো আমার। শূন্য গৃহ এবার সর্বশান্ত হলো। মানুষের জীবনের অর্থশূন্যতা, সংজ্ঞাহীনতা সেদিনের মতো আর কখনো বুঝিনি।

তারপরও আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করতে চাই, তিনি ফুরিয়ে যান নি। ফুরাতে পারেন না। গর্ভজাত সন্টানদের কথা থাকুক, মহাকালের করতলে যা তিনি সত্যিসত্যিই রেখে গেলেন তা হলো তাঁর অমূল্য সাহিত্য-সৃষ্টি। অত্যুক্তি হবে না, যদি বলি এরাই তাঁর প্রকৃত সন্টান। চারটি কাব্য-সংকলন। এগুলি হলো, গোলাপের সুগন্ধে অশ্রু, সাগরে শালতি, পাথরে নদী ও নীল জোছ্নার গান। জীবনের শেষভাগে এসে একটি গল্প,সংকলন, নাম: যাযাবর ভালোবাসা। শুধুমাত্র এ বইগুলির নাম, দেখেই খন্দকার জাহানারা বেগম সম্পর্কে একটা পূর্ব-ধারণা করে নেয়া যায়, এমনই আবেগে মথিত প্রাণের সুর দিয়ে গড়া এগুলির শিরোনাম কবিতার শরীরে নিজের অন্তরের সবটুকু নির্বাস মিশিয়ে দিয়েছেন। তাই হয়ে থাকলো মার মতো একজন নিঃসঙ্গ মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ আনন্দ-বিরহের আকার, মানবিক মূল্যবোধ, ব্যক্তিজীবনের টানাপোড়েনের কাব্য-দলিল। নিজস্ব দুঃখকে অতিক্রম করে গ্যাছে সার্বজনীন গ্লানি। শেষ জীবনে

দুঃখবাদ সওয়ার হয়েছে তাঁর কবিতার পিঠে এবং তা প্রচন্ডতার সাথে। আর এ বিবেচনায় তিনি একজন দুঃখবাদীও বটে। ব্যক্তিগত চাওয়া-না পাওয়ার অনুভবকে অতিক্রম করেছে তাঁর কবিতার আবেদন হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন। এখানেই তাঁর কবিতার সার্থকতা, বেঁচে থাকার ক্ষমতা। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, যে সৃজনকর্ম ব্যক্তিমানুষকে অতিক্রম করতে পারে, কালের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে যায়, সেই সৃষ্টি কালান্তক, অজর। আর যে সৃজনকর্মের মৃত্যু নেই, তা অবিনাশী ও অনির্বাণ।

ব্যক্তিগত বিষয়ে ফিরে আসি। রাজশাহী শহরে, 'ছায়ানীড়' নামের ছায়া-সুনিবিড় বাড়িতে আজো কালে-ভদ্রে আমাকে আসতে হয়। এক সময়ের ব্যস্ত, জমজমাট বাড়িটি আজ প্রায় সুনসান পড়ে আছে, য্যানো পাষাণপুরী। ইট-পাথরের বুক চিরে সে য্যানো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে সারাক্ষণ। আর অপেক্ষা করছে বাড়ির একজন বিশেষ মানুষের জন্য।

আজো খেজুর নামের মেয়েটি প্রতিদিনের মতো বিছানা-বালিশ গুছিয়ে রাখে, ঘর সাজিয়ে দ্যায়। হাতের লাটি, টেবিল-ঘড়ি, চশমা যে যার অবস্থান থেকে তাকিয়ে থাকে, য্যানো বলতে চায়, 'আমাদের মালকিন, কোথায়? তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো তাঁকে? আলমারি -ভর্তি সার্ সার্ বইয়ের চোখেও য্যানো সেই একই প্রশ্ন। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়-ভয়ে নয়, শূন্যতায়। জীবন এ্যাতো কঠিন ক্যানো? মহাকাল আর কতোকাল চুপচাপ চেয়ে থাকবে? অপেক্ষা করো মা– আমরাও আসছি। আমিও।

জীবনের সমস্ত সিদুঁর ধূসর হয়ে আসছে যে!

যুবায়ের হাসান, ঢাকা, ১৫ নভেম্বর ২০০৭